তাওহীদ পন্থীদের নয়নমণি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৬৫তম অধ্যায় - তাওহীদের সংরক্ষণ এবং শির্কের সকল দরজা বন্ধ করণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচেষ্টাসমূহের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে (باب ما جاء في حماية النبي صلى الله حمى التوحيد وسده طرق الشرق)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)

অনুবাদকের সংযুক্তিঃ

নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শির্কের দিকে পৌঁছায় এমন যাবতীয় পথকে বন্ধ করেছেন এবং উহা হতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেনে। উহার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেনঃ

প্রশংসা করা, কুৎসা রটানো, ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমালংঘন করাকে বাড়াবাড়ি বলা হয়। আহলে কিতাবদের মাঝে ইহাই হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

‘‘হে আহলে কিতাব! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা আর সত্য ছাড়া কোনো কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করোনা। মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রাসূল ও কালেমা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, যা আল্লাহ মারইয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে একটি রূহ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা মারইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো এবং তিন বলোনা। তোমরা তিন বলা হতে বিরত হও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট’’। (নিসাঃ ১৭১) নাসারাগণ ঈসা (আঃ)এর প্রশংসায় সীমালংঘন করে বলছে, তিনি হলেন আল্লাহর পুত্র এবং তারা তাকে তিনজন উপাস্যের তৃতীয় জন সাব্যস্ত করছে। পক্ষান্তরে তার কুৎসা রটনায় ইহুদীরা সীমালংঘন করে বলছে, তার মা হল ব্যভিচারিনী, আর তিনি হলেন জারয সন্তান। (নাউযু বিল্লাহ্)। এ থকে বুঝা যায় যে, উভয় দলই তাঁর ব্যাপারে সীমালংঘন করছে।

সীমালংঘন করার কারণে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়ঃ

ক) যার ব্যাপারে সীমালংঘন করা হয়েছে তাকে তার মর্যাদার উপরে উঠানো হয়, যদি তা প্রশংসার মাধ্যমে হয়। আর তার মর্যাদা হানী করা হয়, যদি তা কুৎসা রটানোর মাধ্যমে হয়

খ) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা প্রশংসিত ব্যক্তির এবাদতের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

গ) উহা আল্লাহ্র বড়ত্ব প্রকাশের পথে বিরাট বাধা। কারণ মানুষ ঐ সময় বাতিল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ঘ) যার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা হয়েছে সে উপস্থিত থাকলে আত্মগর্ব বোধ করার সম্ভাবনা থাকে এবং নিজেকে বড় মনে করার আশঙ্কা থাকে। যদি সে অতিরঞ্জন প্রশংসার মাধ্যমে হয়। আর উহা শত্রুতা ও বিদ্বেষ অবধারিত করে। যদি তা কুৎসা রটানোর মাধ্যমে হয়।

সীমালংঘনের প্রকারভেদঃ

ক) আকীদার ক্ষেত্রে সীমালংঘনঃ

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর মানুষ সীমালংঘন করে থাকে। তাদের একদল আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করছে। আরেকদল আল্লাহর জন্য উপমা পেশ করছে এবং আল্লাহর গুণাবলীকে মানুষের গুণাবলীর মতই বলেছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হচ্ছে উপরোক্ত উভয় দলের মাঝখানে। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করে, কিন্তু আল্লাহর গুণসমূহকে মানুষের কোনো গুণের সাথে তুলনা করেনা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

‘‘সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরাঃ ১১)

খ) এবাদতের ক্ষেত্রে সীমালংঘনঃ

দ্বীন পালনে বাড়াবাড়ি করা দোষণীয়। এ ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ এবাদতের সামান্যতম ত্রুটিকে কুফুরী ও ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার কারণ মনে করে। যেমন খারেজী ও মুতাযেলাগণ করেছে। এদের বিপরীত হলো মুরজিয়া ফির্কা। তারা বলেঃ কবীরা গুণাহ্ করলে ঈমানে কোনো ঘাটতি হয়না, মৌখিক স্বীকৃতিই প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর ভিত্তিতে তাদের নিকটে ইবলীসও ঈমানদার। কারণ সেও আল্লাহকে স্বীকার করে। উপরোক্ত উভয় দলই বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মধ্যম পন্থা হল সুন্নী জামাআতের পন্থা। তা হল, গুনাহ করলেই কোনো মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়না; বরং তার ঈমানে ঘাটতি আসে এবং পাপকাজ অনুসারে ঈমান হ্রাস পায়।

এবাদতের মধ্যে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো যেমন এবাদত করতে গিয়ে নিজেকে অধিক কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করা। ইহা সীমালংঘন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন। এমনি শরীয়তের সীমা অতিক্রম করাও নিষেধ। যেমন হজ্জের সময় মিনার জামারাতগুলোতে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা।

এবাদতে সীমা লংঘন করার উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামারায়ে আকাবার দিন সকালে বললেন, আমার জন্য কঙ্কর কুড়াও তখন তিনি স্বীয় উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমি তাঁর জন্য ছোলার দানার মত সাতটি কঙ্কর কুড়ালাম। উহা তিনি স্বীয় হাতে রেখে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, তোমরা এই রকম পাথর নিক্ষেপ করো। আর তোমরা সাবধান থাকো দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

অত্র হাদীছ দ্বারা অতিরঞ্জন করা হারাম প্রতিপন্ন হল দু’টি দিক থেকে। এক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে এক দিকে যেমন বাড়াবাড়ি করা থেকে নিষেধ করেছেন, অন্য দিকে উল্লেখ করেছেন যে, উহা পূর্ববর্তী

লোকদের ধ্বংসের কারণ। আর যা ধবংসের কারণ, তা অবশ্যই হারাম।

মানুষ এবাদতের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ হয়ে থাকেঃ

তাদের মধ্যকার দুটি শ্রেণী দুই দিকে থাকে। তৃতীয় শ্রেণী হলো মধ্যম পন্থী। তাদের মধ্যে কেউ বাড়াবাড়ি কারী আবার তাদের মধ্যে কেউ হল ত্রুটিকারী। গ্রহণযোগ্য পন্থা হলো মধ্যম পন্থা। দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা ও অতিরঞ্জন করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে বৈধ নয় উহাতে শৈথিল্য করা। বরং আবশ্যক হলো মধ্যম পন্থা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূণ্যবান ও অলীদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এই বাড়াবাড়ি তাদেরকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করার দিকে নিয়ে যায়।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ একদা কিছু লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হে আমাদের উত্তম ব্যক্তি! হে আমাদের উত্তম ব্যক্তির সন্তান! হে আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বল। তবে লক্ষ্য রাখবে শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি চাইনা যে, তোমরা আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার উপরে উঠাও। (নাসায়ী)

গ) লেনদেন বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িঃ লেনদেন বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে সাধারণত কোনো হালাল বস্তুকে হারাম করার মাধ্যমে। মূলতঃ ইহাই হলো সুফীদের তরীকা। তারা বিনা দলীলে আল্লাহর অনেক হালাল জিনিষকে নিজেদের উপর হারাম করে থাকে। ঠিক এদের বিপরীতে রয়েছে আরেক শ্রেণীর মানুষ, যারা সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য সকল বস্তুকেই হালাল মনে করে। এমনকি সুদ ও প্রতারণাও তাদের কাছে অবৈধ নয়।

এই বাড়াবাড়ির কারণে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। আর মধ্যম পন্থা হল, শরঈ বিধান অনুযায়ী কিছু লেনদেন বৈধ আবার শরঈ বিধান অনুযায়ী কিছু লেনদেন অবৈধ।

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর ভিত্তি স্থাপন করতে নিষেধ করেছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর ভিত্তি স্থাপন তথা কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আবুল হাইয়্যাজ আল্ আসাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আলী বিন আবু তালেব একদা আমাকে বলেনঃ হে আবু হাইয়্যাজ! আমি কি তোমাকে ঐ কাজ দিয়ে প্রেরণ করবনা যা দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করেছিলেন? আর তা হলো, তুমি কোনো মূর্তী পেলে তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে, উচু কোনো কবর পেলে তা মাটি বরাবর না করে ছাড়বেনা। (মুসলিম) রাসূল (ﷺ) কবরে চুনকাম করতে, তার উপর বসতে এবং উহা পাকা করতে নিষেধ করছেনে। (মুসলিম)

অনুরূপ কবরে বাতি জ্বালানোও নিষিদ্ধ। ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত কারিনী মহিলাদেরকে এবং উহার উপর মসজিদ নির্মাণ এবং উহার উপর বাতি প্রজ্জ্বলিতকারীদের অভিশম্পাত করেছেন। (সুনান গ্রন্থ সমূহ, হাদীছটি যঈফ) তা ছাড়া কবরে বাতি জ্বালানো বিধর্মীদের আচরণ। তাই উহা অবশ্যই বর্জনীয়।

৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেনঃ জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, সাবধান! নিশ্চয়ই

তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা আমার কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করবেনা। আমি এ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। (মুসলিম) কবরকে মসজিদ বানোনোর অর্থ হল উহার পাশে সালাত আদায় করা, যদি উহার উপর মসজিদ নির্মাণ না করা হয়।

কবরস্থানসমূহের যিয়ারত শরীয়ত সম্মত আমল। কবরবাসীগণ দুআর মুখাপেক্ষী। তারা যাতে উপকৃত হয় এমনভাবে তাদের যিয়ারত করা উচিত, তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য যিয়ারত করা বৈধ নয়। সুতরাং যে যিয়ারতের দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের থেকে উপকার অর্জন উদ্দশ্যে হয় উহা বিদআতী যিয়ারত। পক্ষান্তরে যে যিয়ারত দ্বারা মৃতদের উপকার ও তাদের অবস্থা থেকে উপদেশ গ্রহন করা উদ্দেশ্য হয়, তা শরীয়ত সম্মত যিয়ারত। ইবনে সাদী (রঃ) বলেন, কবরে যা করা হয় তা দুই প্রকারঃ

প্রথম: শরীয়ত সম্মত। আর উহা হল শরঈ তরীকা মুতাবেক যিয়ারত। এতে কবরকে উদ্দেশ্য করে সফর করা হয়না; বরং এর মাধ্যমে সুন্নতের অনুসরণ করা হয়। এই প্রকার যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো আখেরাতের উপদেশ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ঃ নিষিদ্ধ যিয়ারত। ইহা আবার দুই প্রকারঃ

এমন যিয়ারত, যা হারাম এবং যা মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়। যেমন কবর স্পর্শ করা এবং কবরবাসীদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা। সেখানে সালাত আদায় করা, উহা আলোকিত করা, কবর পাকা করা এবং উহার অধিবাসীদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা। যদিও উহা এবাদত পর্যন্ত না পৌঁছে। আরেক প্রকার নিষিদ্ধ যিয়ারত হচ্ছে, যা সরাসরি শির্ক। যেমন কবরবাসীদেরকে আহবান করা, তাদরে নিকট সাহায্য চাওয়া, তাদের নিকট চাহিদা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের আশা করা। ইহা ঠকি তেমনি, যা মূর্তীপূজাকারীরা তাদের মূর্তীসমূহের সাথে করত।

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবরকে বার বার যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেনঃ

শির্কের পথ বন্ধ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তিনি তাঁর নিজ কবরের পাশে অভ্যাসগতভাবে দুআ করা এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। বরং এর পরিবর্তে যে কোনো স্থান হতে তাঁর উপর বেশী বেশী দুরূদ ও সাল্লাম পড়তে বলেছেন। কারণ উহা তাঁর নিকটে পৌঁছে থাকে। আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর এভাবে বারবার যিয়ারত করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তবে অন্যান্য কবরগুলোকে উৎসবের স্থানে পরিণত করার নিষিদ্ধতা আরো উত্তমভাবেই প্রমাণিত হয়।

আলী বিন হুসাইন (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর বরাবর ফাঁকা স্থানে প্রবেশ করে দুআ করছে। তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন আর বললেন আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাবোনা যা আমি শুনেছি আমার পিতা হুসাইন হতে তিনি আমার দাদা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে, আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমার কবরকে তোমরা উৎসবের স্থান হিসাবে এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করোনা। আমার উপর দুরূদ ও সাল্লাম পাঠ করো। কেননা তোমাদের সালাত ও সাল্লাম আমার কাছে পৌঁছে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন।

৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেনঃ

তাদের উৎসবে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এবং তাদের সাথে বিশেষিত প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। আর উহা এ জন্যই করেছেন যাতে কাফেরদের সাথে বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হতে মুসলিমদেরকে দূরে রাখা যায়। কারণ ইহা মূলতঃ শির্কের ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। অনুরূপ তিনি এমন নিষিদ্ধ সময়গুলোতে নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যে সময় মুশরিকরা গাইরুল্লাহকে সিজদা করে। আর তা এজন্য যাতে নিষিদ্ধ সাদৃশ্য অবলম্বিত না হয়। অনুরূপ এমন স্থানে পশু যবেহ করতে নিষেধ করছেন, যেখানে জাহেলী যুগের কোনো উপাস্য ছিল। যদিও তা বর্তমানে না থাকে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা উদ্দেশ্য না হয়।

ছাবেত বিন যাহহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলনেঃ জনৈক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে উট যবেহ্ করার মানত করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উহাতে কি জাহেলী যুগের কোনো মূর্তী কিংবা পূজার বস্তু ছিল যার এবাদত করা হতো? তারা বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে কি তাদরে কোনো ঈদ-উৎসব পালিত হতো? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। কেননা আল্লাহ্র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নযর পূর্ণ করা চলেনা। ঠিক ঐ বিষয়ের মানত করাও চলেনা, আদম সন্তান যার মালিক নয়। (আবু দাউদ)

৬) স্মরণার্থে নির্মিত বিশেষ পদ্ধতির চিহ্ন ও পাথর এবং ছবির প্রতি সম্মান প্রর্দশন করতে নিষেধ করা হয়েছেঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণীর ছবি অঙ্কনের ব্যাপারে সর্তক করেছেন। বিশেষভাবে সম্মানিত ব্যক্তিদের যেমন আলেম, আবেদ, পরিচালক, নেতা প্রমূখ ব্যক্তিদের ছবি অঙ্কন করতে নিষেধ করেছেন। সকল মূর্তি একই পর্যায়ের। হোক তা কাঠের উপর, কাগজের উপর, দেয়ালের উপর কিংবা কাপড়ের উপর অথবা ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে হোক অথবা খোদাই করে মূর্তির আকৃতিতে তৈরী করা হোক। কারণ এ ছবিই হল শির্কে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। এটা এজন্য যে, ছবি উঠানো এবং ছবি নির্মাণ করার মাধ্যমেই পৃথিবীতে র্সবপ্রথম শির্কের সূচনা হয়েছে। নূহ্ (আঃ)এর গোত্রে কিছু সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তারা মৃত্যুবরণ করলে মানুষ শোকাহত হয়। ফলে শয়তান তাদের নিকট এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে, তাদের বসার স্থানসমূহে মূর্তি খাড়া করো এবং তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখো। তারা তাই করল। তবে তখনো মূর্তিগুলোর পূজা শুরু হয়নি। যখন তারা মৃত্যু বরণ করল এবং ইলম চর্চা উঠে গেল তখন ঐ ম~ূর্তগুলোর এবাদত শুরু হতে লাগল।

হে পাঠক! লক্ষ্য করুন, স্মরণার্থে নির্মিত এই মূর্তিগুলোর কারণেই শির্কের সূচনা হয়। পরবর্তীতে উহাই নূহ্ (আঃ)এর সাথে বিরোধীতার কারণ হল, যা তাদের জন্য মহাপ্লাবন ডেকে এনেছিল।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ছবি অঙ্কন করা এবং স্মৃতিস্বরূপ মূর্তি নির্মাণ করা মারাত্মক অপরাধ। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি অংকনকারীদেরকে অভিশম্পাত করেছেন। আবু জুহায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশম্পাত করেছেন ওয়াশিমাকে এবং মুস্তাওশিমাকে, অভিশম্পাত করেছেন সুদ গ্রহীতা ও সূদ দাতাকে। তিনি আরো নিষেধ করেছেন কুকুরের মূল্য ও ব্যভিচারীনীর উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ করা হতে। তিনি অভিশম্পাত করেছেন ফটো অংকনকারীদেরকে। (বুখারী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির স্বীকার হবে ছবি অংকনকারীগণ। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবিগুলোকে মিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সংবাদ

দিয়েছেন, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেস্তা প্রবেশ করেনা। কাসেম বিন মুহাম্মাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বর্ননা করে শুনিয়েছেন যে, তিনি একটি চাদর ক্রয় করে ছিলেন যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তা দেখলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ছাপ লক্ষ্য করলাম। তাই বললাম হে রাসূল! আমি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এই চাদরের অবস্থা কি? আমি বললামঃ আমি উহা ক্রয় করেছি যাতে আপনি তার উপরে বসতে পারেন ও বালিশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ নিশ্চয়ই এই ছবি গুলো প্রস্তুতকারী কিয়ামত দিবসে শাস্তির শিকার হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ যা সৃষ্টি করেছো তাতে জীবন দান করো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ যেই ঘরে ছবি রয়েছে, সেই ঘরে কখনই রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন শব্দসমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যা শির্কের ধারণা দেয়ঃ শির্কের পথ বন্ধ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে এমন শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, যা শির্কের ধারণা দেয় অথবা যার মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদতের অর্থ আছে বলে মনে হয় কিংবা যাতে আল্লাহর শানে বে-আদবী করা হয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম ও শব্দ নির্বাচনে সতর্ক হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলেঃ তুমি তোমার রবকে খাবার দান করো, তোমার রবকে অযু করাও। বরং সে যেন বলেঃ আমার সায়্যেদ নেতা, আমার মনিব অনুরূপ তোমাদের কেউ যেন না বলে আমার দাস আমার দাসী বরং সে যেন বলে, আমার সেবক আমার সেবিকা এবং আমার গোলাম ইত্যাদি। (বুখারী)

৮) বরকতের আশায় বৃক্ষরাজী, পাথর ইত্যাদি স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরকতের আশায়, গাছ, পাথর ইত্যাদি স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ শয়তান ধীরে ধীরে তাদেরকে এগুলোর এবাদতের দিকে অগ্রসর করে এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য এগুলোর কাছে সরাসরি প্রার্থনা করার মানষিকতা গড়ে তোলে। যেমন আবূ ওয়াকেদ লাইসীর হাদীছ থেকে বুঝা যায় তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। তখন আমরা ছিলাম কুফর যুগের নিকটবর্তী নতুন মুসলিম। সেখানে মুশরিকদের একটি কুলবৃক্ষ ছিল যার পাশে তারা উপবেশন করত এবং তাতে নিজেদের হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখত। উহাকে ‘যাতু আন্ওয়াত’ বরকত ওয়ালা বৃক্ষ বলা হত। একদা আমরা এমনই একটি কুলবৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের যেমন ‘যা-তু আনওয়াত’ আছে, আমাদের জন্যও তেমনি একটি ‘যাতু আনওয়াত’ নির্দিষ্ট করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহু আকবার! এগুলো পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতির কথা। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তোমরা ঐরূপ কথাই বললে, যেরূপ বনী ইসরাঈলগণ মূসা (আঃ)কে বলেছিল। তারা বলেছিল, আপনি আমাদের এবাদতের জন্য মাবুদ ঠিক করে দিন যেমন তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট মাবুদ রয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন তোমরা অজ্ঞ জাতি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ দেখ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি নীতি অনুসরন করে চলবে। হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করত: উহাকে সহীহ বলেছেন, অত্র হাদীছটিকে ইমাম আহমাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুও বর্ণনা করেছেন।

মুশরিকরা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ঐ বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখতো বরকত হাসিলের জন্য। সাহাবীগণও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামএর নিকট আরয করলেন যেন তাদের সমরাস্ত্রগুলো ঝুলানোর জন্য একটি বরকতময় বৃক্ষ নির্ধারণ করেন। তাদের এ দাবীর উদ্দেশ্য ছিল উক্ত বৃক্ষ দ্বারা বরকত লাভ করা। উহার এবাদত করা নয়। আর উহা দ্বারা বরকত গ্রহণ করা যদি উহার এবাদত করার উদ্দেশ্যে হয় তবে ইহা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবে।

তবে আল্লাহ তাআলা যে সকল জিনিষকে বরকতময় করেছেন, শরীয়ত সম্মত পন্থায় তা থেকে বরকত অর্জন করার চেষ্টা করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং তা থেকে বরকত হাসিলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ সব বস্তু থেকে নিম্নে কতিপয় বিষয়ের আলোচনা করা হলোঃ
ক) কথা, কাজ ও অবস্থা দ্বারা বরকত অর্জন করাঃ
কোন মুসলিম যদি কল্যাণ এবং বরকতের আশায় এগুলো সম্পাদন করে এবং সে ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুস্মরণ করে তাহলে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। কথা দ্বারা বরকত লাভের আশা করা যেমন আল্লাহ্‌র যিকির, কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘‘এবং এটি এমন একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি। ইহা বরকতময়, এর অনুসরণ করো এবং ভয় করো, যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও’’। (সূরা আনআমঃ ১৫৫) কুরআনের বরকত হলো, ইহার একটি হরফের নেকী দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, অনুরূপভাবে উহা মানুষের জন্য রোগ মুক্তি, হেদায়াত এবং রহমতের উপকরণ এবং উহা তেলাওয়াত কারীর জন্য সুপারিশকারী ইত্যাদি।

খ) কর্ম দ্বারা বরকত লাভের আশা করাঃ

১) ইলম অর্জন করা ও তা অধ্যয়ন করাঃ উহার বরকত হলো দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতি লাভ।

২) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করাঃ উহার বরকত হলো নেকী বেশী হওয়া, গুনাহের কাফ্ফারাহ্ হওয়া ইত্যাদি।

গ) স্থান থেকে বরকত হাসিল করাঃ

যে সকল স্থানের মধ্যে আল্লাহ বরকত রেখেছেন তা থেকে বরকত হাসিলের আশা করা। এ ধরনের বরকত হাসিল করা বৈধ। যদি কোন ব্যক্তি তার ঐ আমলে নিয়তকে খালেস করে এবং এককভাবে রসূলের অনুসরন করে। এই সমস্ত বরকতপূর্ন স্থানের মধ্যে অন্যতম হলঃ মসজিদ সমূহঃ মসজিদ থেকে বরকত অর্জন সম্ভব হবে জামাআতে নামায পড়া, ই’তেকাফ করা, ইলমী মজলিসে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। তবে এই মসজিদগুলোর দেয়াল, কিংবা উহার মাটি স্পর্শ করে তাবাররূক আশা করা বৈধ হবে না। কারণ তা নিষিদ্ধ। অনুরূপ ফযীলতপূর্ণ ও বরকতময় স্থান সমূহের অন্যতম হলোঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদুল আকসা, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া এবং হজ্জের পবিত্র স্থান সমূহ। যেমন আরাফা, মুযদালিফা, মিনা ইত্যাদি। এ সব স্থানে এবাদতের মাধ্যমেই বরকত হাসিল করতে হবে।

ঘ) সময় দ্বারা বরকত অর্জন করাঃ যে সময়গুলোকে ইসলামী শরীয়ত বিশেষ ফযীলত, বরকত ও গুনাহ মাফ ইত্যাদী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করেছে, ঐ সময়গুলোর অন্যতম হলঃ কদরের রাত্রি, রমাযানের শেষ দশ দিন, দশই যুল-হজ্জ, জুম্আর রাত্রি ও জুমআর দিন, জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে বরকতের অনুসন্ধান হতে হবে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নির্দেশিত পন্থার অনুসরন করে।

ঙ) বরকতময় অবস্থা দ্বারা বরকত হাসিল করাঃ বরকতময় কতিপয় অবস্থার অন্যতম হলঃ একত্রিত হয়ে খানা খাওয়া, পাত্রের এক পাশ হতে খাদ্য গ্রহণ করা এবং খাবার শেষে আঙ্গুল চেটে খাওয়া ইত্যাদি। আর উহা দ্বারা বরকত কামনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দিক নির্দেশনার অনুসরনের মাধ্যমেই সম্ভব।

চ) কতিপয় খাদ্য দ্বারা বরকত হাসিল করাঃ ঐ সমস্ত খাদ্য দ্বারা বরকত অর্জন করা যেগুলোর বরকত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিংবা কিতাবুল্লাহ্ হতে প্রমাণিত। সেগুলোর অন্যতম হল যায়তুনের তৈল, দুধ, কালো জিরা, যমযমের পানি ইত্যাদি।

ছ) কতিপয় পশু পাখি দ্বারা বরকত হাসিল করাঃ কতিপয় পশুর মধ্যেও বরকত আছে বলে বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ঘোড়া প্রতিপালন ইত্যাদি।

জ) বৃক্ষরাজি দ্বারা বরকত গ্রহণ করাঃ ঐ সমস্ত বৃক্ষরাজি দ্বারা বরকত অর্জন করা জায়েয, যে গুলোর বরকতের কথা শরীয়তে এসেছে। যেমন খেজুর গাছ, যায়তুন গাছ ইত্যাদি। কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা এগুলোর মধ্যে বরকত থাকার কথা সুপ্রমাণিত। তবে এ ক্ষেত্রে শরিয়তের সীমালংঘন করা যাবেনা।

বরকতপূর্ণ স্থান, সময় ইত্যাদি দ্বারা বরকত গ্রহণ করার যে আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তা দ্বারা কেবল শরীয়ত সম্মত নিয়মেই বরকত অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। শরীয়ত সম্মত নিয়মের পরিপন্থী পদ্ধতিতে বরকত হাসিলের চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। যেমন মসজিদ সমূহের দরজা গুলোকে চুম্বন করা, উহার মাটি দ্বারা রোগ মুক্তির আশা করা, কাবা শরীফের দেওয়াল অথবা মাকামে ইবরাহীম ইত্যাদিকে স্পর্শ করা।

দুঃখের বিষয় হলো, কতিপয় মানুষ বিশেষ কোনো এবাদতের স্থানকে শুধু বরকত হাসিলের মাধ্যম হিসেবে মনে করেছে। যেমনঃ কিছু লোক রূকনে ইয়ামানীকে মাসেহ্ করতঃ হাত দ্বারা নিজের চেহারা, বক্ষদেশ এবং ছোট শিশুদেরকে মাসেহ করে। আর এর অর্থই হল তারা রূকনে ইয়ামানীকে বরকত হাসিলের মাধ্যম মনে করেছে, এবাদতের বিষয় গণ্য করেনি। আথচ ইহা একটি মূর্খতা। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ হে পাথর! নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কারো ক্ষতি করতে পারনা, উপকারও করতে পারনা। আমি যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে তোমাকে কখনই চুম্বন করতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

কিছু মানুষের অবস্থা হলো তারা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যায়না; বরং তারা বিশ্বাস করে যে, কবরস্থান বরকতময় স্থান এবং সেখানে দুআ করা উত্তম আমল। এই বিশ্বাসে তারা সেখানে যাতায়াত করে। তারা নামায ও দুআর উদ্দেশ্যে হেরা গুহায় যায়, ছাওর পর্বতে যায়, তূর পর্বত এবং অন্যান্য স্থানে যায়। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, এ সমস্ত জায়গায় যিয়ারত করা যদি মুস্তাহাব হত এবং ওতে ছাওয়াব পাওয়া যেত তাহলে অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা আমাদেরকে জানাতেন। কিন্তু তিনি যেহেতু জানান নি, তাতে বুঝা গেল যে, উহা বিদআত।

অনুরূপ ঐ সমস্ত জায়গা যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ কোনো এক সময় নামায পড়েছেন। যেমন সফরাবস্থায় কোনো স্থানে নামায আদায় করেছেন কিন্তু সে স্থানকে তিনি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। এধরনের স্থান অনুসন্ধান করে উহাতে নামায আদায় করতঃ আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা বিধি সম্মত নয়। কারণ উহার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করা উদ্দেশ্যগত ছিলনা বরং তা হঠাৎ হয়েছিল।

অনুরূপ বরকতময় সময় যেমন রমাযান মাস, কদরের রাত্রি, জুমআর দিন ইত্যাদি থেকে বরকত অনুসন্ধান করতে হবে শরীয়ত সম্মত ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে। বিদ্‌আতী এবাদতের মাধ্যমে নয়।

আমাদের দেশে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন সময়কে বরকতময় মনে করে এবং বিশেষ এবাদতের জন্য উহাকে খাস করে থাকে। যেমন জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, মৃত্যু বার্ষিকী, মিরাজ দিবস, শবে বরাত, হিজরত দিবস, বদর দিবস, মক্কা বিজয় দিবস ইত্যাদি পালন করা। এ সবই বিদআত।

এমনি সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তা ও তাদের রেখে যাওয়া নিদর্শন দ্বারা বরকত অর্জন করা। উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের কারো থেকে এ কথা প্রমানিত নয় যে, তাদের কেউ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অযুর পানি, ঘাম, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দ্বারা বরকত অর্জন করেছেন, বা উমার, উসমান, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখ থেকে কোনো প্রকার তাবাররূক গ্রহণ করা হয়েছে। বরং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর পানি, তাঁর শরীর, ঘাম, থুথু, চুল এবং জামা-কাপড় ইত্যাদি দ্বারা বরকত নিয়েছেন। শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর ব্যবহৃত বস্ত দ্বারাই বরকত হাসিল করা জায়েয ছিল। তাঁর উপর অন্য কোন সৎ ব্যক্তিকে কিয়াস করা যাবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরকতময় ছিলেন। অহীর মাধ্যমে তা জানা গেছে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটি প্রমাণিত নয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12120

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন